অগ্রজ কবির সঙ্গ : কিছু প্রশ্ন, কিছু আলোচনা

রাহুল পুরকায়স্থের সঙ্গে কথোপকথনে তন্ময় ভট্টাচার্য

তন্ময় : তুমি তো প্রায় কম-বেশি চল্লিশ বছর কবিতা লিখছ। কখনও কি এমন মনে হয়েছে, যে, অনেক কবিতা লেখা হয়ে গেল, আর লেখার দরকার নেই; বারবার নিজেকেই পুনরাবৃত্ত করছি? নতুন কিছু বলার নেই। এ-জাতীয় শূন্যতার বোধ কখনও হয়?

রাহুল : না। তবে মাঝে মাঝে নিজেকে ফাঁকা লাগে। মনে হয়, আর-কিছু বলার নেই আমার। কিন্তু তারপর একটা লেখা যখন লিখি, তখন মনে হয় কিছু কিছু কথা বলার আছে এখনও। কখনও-কখনও এমনও মনে হয়, কীভাবে বলছি! আজ থেকে কুড়ি বছর আগে একটা কথা হয়তো একরকমভাবে বলেছিলাম। এই ৫৮ বছর বয়সে এসে সে-কথা হয়তো পাল্টে গেছে। এক-একটা বিষয় একই হয়তো। কিন্তু আমার কাছে নতুনভাবে ধরা দিচ্ছে। সে লেখার ক্ষেত্রে আমার কোনো সমস্যা হয় না। সেটাকে আমার নতুন লেখা বলেই মনে হয়। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, কোথাও একটা মিল আছে সূক্ষ্ম। একটা গাছকে কখনও দেখে মনে হয়েছিল মানুষের বাড়ি। সেই গাছটাকেই যখন অনেকদিন পরে দেখলাম, তার মধ্যে মানুষের ছাপ। মনে হয় মানুষটা গাছের ভিতরে ঢুকে গেছে। ফলে পুরো জিনিসটার আবহ পাল্টে গেল। জায়গাটা কিন্তু একই। বিষয় এক। ভাবনায় কোথাও আলাদা সমস্যা আছে। এরকম আর কী ব্যাপারটা।

তন্ময় : যখন মনে হয় শূন্য লাগছে নিজের ভেতরটা, ফাঁকা লাগছে, সেই সময় নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া বা লড়াই কীভাবে করো? এই আতঙ্ক কি কখনও হয় যে, কবিতা ফুরিয়ে গেছে, আমি আর কিছু লিখতে পারব না?

রাহুল : প্রথমত, কবিতা লিখতে না-পারলে আমার কোনো মনখারাপ হয় না। আমি নিজেকে বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত রাখতে পারি। লেখা যদি আসে তো এল। আজ পর্যন্ত কখনও জোর করে কোনো লেখা লিখিনি। কেউ বললে হয়তো লেখার চেষ্টা করেছি। লেখা হয়েছে। সেটা অন্য কথা। কিন্তু খুব যে জোর করলাম, এমন কোনো স্বভাব আমার নেই। আমার মনে হয়, লেখা আসে। আমি যতই জোর করি না কেন, লেখা আসার হলে আসবে, না হলে আসবে না। লেখাটা আমার কাছে একটা অলৌকিক ব্যাপার বলে মনে হয়।

তন্ময় : ধরো, মাথায় কবিতার আভাস ঘুরছে। কিন্তু সেটা শব্দের ভিত্তি পাচ্ছে না। তখন যে খাতার সামনে বসে চেষ্টা করা, এবং ব্যর্থ হয়ে উঠে যাওয়া— এই ব্যর্থতা তো কবির নিয়তি! তোমারও নিশ্চয় বারবার হয়েছে?

রাহুল : একটা লেখা শেষ হওয়ার পরেই তো ব্যর্থতার জন্ম। আমি কখনও খাতার সামনে শুধু-শুধু বসি না। অধিকাংশ লেখাই আমার একবারে বসে লেখা। আমার লেখাটা মাথায় তৈরি হয়। তারপর সেটা খাতায় নামে। কাটাকুটি করে লেখা খুব কম আছে আমার। আর যে-কোনো লেখাই যখন লিখি, লেখার পরে একটা ব্যর্থতা আসে আমার। মনে হয়, হল না। কিছুই হল না। আবার কখনও সে লেখার কাছে ফিরে আসি। ফিরে এসে সে লেখাকে নতুন করে লেখা, পরিমার্জন করে লেখা, সে আর হয়ে ওঠে না। কোনো লেখার সঙ্গে কখনও-কখনও সন্তানস্নেহে জড়িয়ে পড়ি। সন্তান যদি পঙ্গু হয়, তাহলে আমি তাকে ফেলে দেব নাকি? নয়তো-বা ভয়ে সেই লেখার কাছে যাই না। হয়তো পাঠকের জন্য দিয়ে দিই অনেক সময়। আমি নিজে সে-লেখাটা এড়িয়ে চলি। এ এক অদ্ভুত খেলা!

তন্ময় : এক বই থেকে আরেক বইয়ে যাওয়ার পথে, দুটি বইয়ের মাঝে বাঁকবদল প্রয়োজন হয় কবির। যাতে কবিকে নতুন করে চেনা যায়। এই ব্যাপারটাকে কি তুমি বিশ্বাস করো?

রাহুল : কখনও কখনও বিশ্বাস করি। কিন্তু তা যে বই থেকে আরেক বইতেই হতে হবে, এমন কোনো কথা নেই। একই বইয়ের ভেতরেও হতে পারে বাঁকবদল। আবার নাও হতে পারে। হয়তো সাতটা বইয়ের পরে গিয়ে বাঁক বদলাল। তবে একটা জিনিস আমি মনে করি যে, সত্যিই যদি কেউ কবিতা লিখে চলেন ধারাবাহিকভাবে, সে-কবিতার মধ্যে একটা বদল থাকে। সেটা হয়তো প্রকটভাবে চোখে পড়ে না, কিন্তু প্রচ্ছন্নভাবে থেকে যায়। খুব ভালো করে লক্ষ করলে দেখব, কবিতাতে কোথাও-না-কোথাও একটা বদল, একটু অন্যরকম। মানে সেটা চলমান। সদাভ্রাম্যমাণ। ফলে, তার অবস্থানগত পরিবর্তন হয়। লেখাও পরিবর্তিত হয়। কারো চোখে পড়ে, কারো পড়ে না। কিন্তু এই পরিবর্তনের দায় কোনো লেখকের আছে বলে মনে হয় না। যেহেতু লেখাটা আসে শুধুমাত্র তাঁর কাছেই।

তন্ময় : ব্যক্তিগতভাবে তোমার কখনও মনে হয়েছে যে, কোনো বইয়ে নিজেরই আগের বইয়ের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়েছ?

রাহুল : পুনরাবৃত্ত করছি বলে মনে হয়নি। কিন্তু আমার কখনও কখনও মনে হয়েছে যে, আমার দুটো বই হয়তো খুব কাছাকাছি। যতটা ফারাক থাকা উচিত ছিল, ততটা ফারাক নেই। এবং আমার সম্পর্কে অভিযোগ আছেও, আমি একরকম লিখে যাই। আসলে এ-ক্ষেত্রে আমার কিছু করার নেই। লেখাটা আমার কাছে ওভাবেই

আসে। অনেকে বলেন, আপনার এই বইয়ে সামান্য পরিবর্তন আছে। শুনে খুব মজা লাগে। কেন-না কোনো পরিবর্তন জোর করে করিনি। এবং, আমার চোখে কোনো পরিবর্তন ধরা পড়ে না। একটা লোক যখন হাঁটে রাস্তা দিয়ে, তখন তো হাঁটতে-হাঁটতে যাচ্ছে। সে দেখছে, যে জামাকাপড় পরা ছিল, সেই জামাকাপড়ই পরা আছে। দীর্ঘদিন ধরে হাঁটতে-হাঁটতে জামাকাপড়ে ধুলো পড়ে, ময়লা হয়। সে নিজে টের পায় না। এই যে জার্নি, লেখার ক্ষেত্রেও তেমনই আর কী। আমি যদি সচেতনভাবে ভাবি, পাল্টাবই, সে-পাল্টানো কতটা লেখা হয়ে উঠবে বা কবিতা হয়ে উঠবে, তা নিয়ে আমার সন্দেহ আছে। যদিও আমার প্রিয় কবি উৎপলকুমার বসু খুব সোচ্চারভাবে পরিবর্তিত হয়েছেন বিভিন্ন জায়গায়।

তন্ময় : এবং সচেতনভাবে।

রাহুল : হ্যাঁ সচেতনভাবেই। খুব ইন্টারেস্টিং বিষয়গত পরিবর্তন আনতে পেরেছিলেন। আমরা বলতাম যে, একটা কালোজিরে নিয়েও কবিতা লিখতে পারেন উনি। এবং সে-লেখা তিনি আন্তর্জাতিক করে তুলতে পারেন। এটা আসলে ভাবনার ভাস্কর্য আর কী। যে যেমনভাবে ভাবে।

তন্ময় : আচ্ছা, অনেক তরুণ কবিই এখন (হয়তো আগেও ছিল) লিখতে এসে দু-এক বছরের মধ্যেই চারপাশের প্রশংসা-খ্যাতির মোহে পড়ে কবিতার বই বের করে ফেলে। কিংবা দুটো বইয়ের মাঝখানে খুব কম সময়ের ব্যবধান রাখে। এই বিষয়টাকে তুমি কী চোখে দেখো?

রাহুল : এই ফাঁদে আমরাও পড়েছিলাম। আজ মনে হয়, আমার প্রথম বই যখন বেরিয়েছিল, তার দশবছর পর দ্বিতীয় বই বেরনো উচিত ছিল। প্রচুর কাঁচা লেখা লিখেছি। ছন্দে ভুল। তবে একটা জিনিস আমার মনে হয়, কখনও-কখনও তেমন বই বেরনোও ভালো। তাতে অন্তত কবিকে স্পর্শ করা যায়। তিনি কোথা থেকে উঠে এসেছেন, তা বোঝা যায়। কিন্তু প্রস্তুতিরও প্রয়োজন আছে কোথাও একটা। সে-প্রস্তুতি একমাসের হতে পারে, একবছরের হতে পারে বা দশ বছরেরও হতে পারে। যেমন জয়দার (জয় গোস্বামী) প্রথম বই 'ক্রীসমাস ও শীতের সনেটগুচ্ছ' অসামান্য বই। এবং সে-লেখা খুব বেশি বয়সের নয়। এরকম অনেক বইয়েরই নাম করা যায়। উৎপলকুমার বসুর 'পুরী সিরিজ'। উৎপলদা প্রচুর লিখতেন। কিন্তু বইটা করতেন কখনও ষোলোটা বা কখনও বারোটা কবিতা নিয়ে, বাছাই করে। উল্টোদিকে শক্তিদা (শক্তি চট্টোপাধ্যায়) যা লিখতেন তাই ছাপতে দিয়ে দিতেন। এর ফলে শক্তিদার রান্নাঘরটা চেনা যায়। উৎপলদার রান্নাঘর চেনা যায় না। একটা রহস্য থাকে কোথাও। শক্তিদার রান্নায় রহস্য থাকে।

Scanned with OKEN Scanner

তন্ময় : এই প্রসঙ্গেই তোমার সঙ্গে আগে একদিন আলোচনা হচ্ছিল যে, অনেক তরুণ আজকাল প্রথম বই থেকেই নিখুঁত এবং গভীর। বন্দিতও। তার উদাহরণ অবশ্য আগেও অনেক ছিল। তুমি বলেছিলে, বয়সোচিত প্রেম-বিরহ বা ছন্দে ভুল ইত্যাদি কাঁচা উদাহরণগুলো প্রথম বই থেকেই অন্তর্হিত। যেন অত্যন্ত পরিণত সব লেখাই। সেগুলো কি ইচ্ছাকৃতভাবে পরিণত করা, না সময় তাদের মধ্যে ওই বোধটা জন্ম দিচ্ছে? তোমার কী মনে হয়?

রাহুল : আমার নিজের মনে হয়, ইচ্ছাকৃত পরিবর্তনটাই বেশি। সময় যে-বোধের জন্ম দেয়, তারও কিছু-কিছু চিহ্ন থাকে। সে-চিহ্ন হচ্ছে বয়সের চিহ্ন। সময় অর্থে বয়স। সময়টা তুমি জড়িয়ে নিচ্ছ বয়স হিসেবে। তার তো ছাপ থাকবেই কোথাও। আমি ভাবতাম, বয়স হয়ে গেছে বলে এটা হচ্ছে কি না। একটা বাচ্চা ছেলে কবিতা লিখতে এসেছে, তার জীবনে প্রেম নেই, কিছু নেই। এমন একটা বিষয় নিয়ে কবিতা লিখতে শুরু করল যে, বহু বছর পরে একটা মানুষ অনুশীলনের মাধ্যমে সেখানে ঢুকতে পারে। যেতে পারে। ধরো, রমেন্দ্রকুমার অল্পবয়সেই লিখতে পারেন যে, 'সার্জেন্টের হাত ফসকে উড়ে গেল পাখি/পাখি উড়ে যায়।' একটি ছেলে কবিতা লিখতে এসেই যদি এমন লেখা শুরু করে দেয়, তখন কখনও কখনও সন্দেহ জাগে। তবে অনেকসময় প্রতিভাবানরা আসেন, সৃষ্টি করেন—হয়তো আমরা ধরতে পারি না।

তন্ময় : এর বিপরীতে কেউ কেউ যুক্তি দেন যে, কখন যে কার মধ্যে কীভাবে স্ফূরণ হয় সেটা বয়স দিয়ে হয়তো বিচার করা যায় না।

রাহুল : বয়স দিয়ে বিচার করা যায় না। কিন্তু একটা ছাপ থাকে। যাঁরা কবিতা লিখে এসেছেন, প্রত্যেকের কবিতায় সেই ছাপটা রয়ে গেছে। বয়সজনিত যে-ছাপ। কিন্তু সে-ছাপ কখনও না-ও থাকতে পারে। হয়তো সে তৈরি হয়েই জন্মেছে। বা সব জেনে পড়াশোনা করেই বই করেছে।

তন্ময় : তোমার কবিতায় ইঙ্গিতের প্রাধান্য বেশি। আবার, অন্যদের অনেক কবিতাই কিছুটা কাহিনিমূলক, বর্ণনামূলক হয়। তোমার কবিতা সবসময় ইঙ্গিতধর্মী। তুমি কি মনে করো, ইঙ্গিত বা শব্দ মানুষকে বেশি রহস্যের দিকে এগিয়ে দেয়?

রাহুল : আমি মনে করি না। তবে, আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে সংকেতের সঙ্গে ঘর করতে ভালোবাসি। একটা সংকেত আমাকে অনেককিছু বলে। একটা লেখায় একসময় লিখেছিলাম, 'কাহিনিরা মৃত, আর, মৃতেরা কাহিনি লিখে যায়'। আমি বিশ্বাস করি এটা। কবিতা হচ্ছে ভীষণ ঘটমান বর্তমান একটা বিষয়। প্রথম লাইন লেখার পরে কোনদিকে যাব, আমি নিজেও জানি না। এর ফলে সংকেতধর্মী কবিতার প্রতি একটা ভালোবাসা বা ভালোলাগা আছে। কাহিনিধর্মী কবিতা যে লেখার চেষ্টা করিনি, তা নয়। যুত পাই না। মনে হয় যে, কোথাও গিয়ে এ-লেখা আমার নয়।

Scanned with OKEN Scanner

তন্ময় : ছন্দের অর্ন্তনিহিত চলন তোমার বেশিরভাগ কবিতায় থাকে। গদ্যকবিতা বিষয়টা কি তুমি এড়িয়ে যাও সচেতনভাবে?

রাহুল : না, আমি এড়ানোর চেষ্টা করি না। কিন্তু আমার গদ্যকবিতা অনেকসময় পড়লেও মনে হবে, একটা ছন্দ আছে তাতে। এবং আমি এড়ানোর চেষ্টা করি না জোর করে। এমন কবিতাও আছে, আমার লিখে ফেলার পরের দিন আর ভালো লাগেনি। বিশেষ করে আমি যখন নেশা করতাম, তখন রাতে বাড়ি ফিরে এসে হয়তো লিখলাম প্রচুর। সকালবেলা সেগুলো পড়তে বসে দেখা গেল, হয়তো তিনটে লেখা ভালো লাগল। এগুলো রাখা যায়। আমি নিজেও জানি না, এগুলো কী লিখেছি আমি। মাঝে-মাঝে মনে হয়, লেখা এক অলৌকিক ব্যাপার। একটা শব্দ কোথা থেকে আসবে, একটা লাইন কোথা থেকে আসবে, একটা যতিচিহ্ন কোথা থেকে আসবে তুমি নিজেও জানো না, লেখার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত।

তন্ময় : ব্যক্তি রাহুল পুরকায়স্থের কাছে আমার আরেকটি প্রশ্ন। আমার জানা মতে, তোমার জীবনকে দু'টি ফেজে ভাগ করতে পারি। একটা হচ্ছে, ২০১৭-১৮ পর্যন্ত, যখন তুমি নেশা করতে, তখন নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তোমার কাছে প্রচুর কবিতা এসেছে। বলতে, নেশায় চুর অবস্থাতেই কবিতা লেখো তুমি। তারপর, তুমি যখন মদ্যপান ছেড়ে দিলে, তখনও তো কবিতা তোমার থেকে চলে যায়নি। এই দুটি পর্যায়ে কবিতা আসার মধ্যে কী ফারাক? নেশা কি সত্যি কাউকে প্রভাবিত করতে পারে লেখার ক্ষেত্রে?

রাহুল : ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হয়, পারে। আমার কাছে নেশা একধরনের অর্থহীনতার জন্ম দেয়। পরে, লোকটি যদি নেশা ছেড়েও দেয়, তখনও সেই অর্থহীনতা সে বহন করে চলে।

তন্ময় : সেটা কি ভাষা ও স্কিল হাতে জমে যায় বলে?

রাহুল : হতে পারে। প্রথমত, কায়দাটা তাঁর রপ্ত হয়ে যায় বলে। বা নেশার সময় যে ঘোরটা থাকে, সেই ঘোরটা তাঁকে সারাজীবন তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। মানে, যে নেশা ছেড়ে দেয়, সে-ও একরকমের নেশাসক্ত। ফলে লেখার সঙ্গে ঘোর বা নেশার সম্পর্ক আছে বলে আমার মনে হয় আর কী। একটা জরুরি বিষয় হল, নেশা যে অর্থহীনতার জন্ম দেয়, তুমি কী বলছ, কী লিখছ— পরে হয়তো মিলিয়ে দেখা গেল, তার সঙ্গে একটা যোগাযোগ আছে।

তন্ময় : এবার খানিক অন্য প্রসঙ্গে যাই। যতিচিহ্ন কতটা কবিতার অংশ? এবং যতিচিহ্ন কতটা কবিতা হয়ে ওঠে? যতিচিহ্ন বা প্যারাগ্রাফের ব্যবহার সম্পর্কে তোমার দর্শন কী?

Scanned with OKEN Scanner

রাহুল : বিরাট! বিরাট ভূমিকা। একটা কমা বিপ্লব ঘটিয়ে দিতে পারে। একটা সময় আমি যতিচিহ্ন পরিহার করেছিলাম। কিন্তু দেখলাম, আমি যা বলতে চাইছি তা বলতে পারছি না। বিশেষ করে কমা। সেমিকোলন এখন বোধহয় ব্যবহৃত হয় না। কিন্তু একটা কমার ভীষণ জোর। এক্সক্লেমেশন, ড্যাশ— এমন কিছু কিছু জিনিস রয়েছে, যারা কবিতার ক্ষেত্রে অবলম্বন-প্রায়। অর্থকে এ-মাথা থেকে ও-মাথা ঘুরিয়ে দিতে পারে।

তন্ময় : তুমি প্রায় চল্লিশ বছর ধরে যে কবিতা লিখেছ, তার বেশিরভাগই ইঙ্গিতধর্মী বা সংকেতধর্মী। যে কবিতার মধ্যে কাহিনি লুকিয়ে থাকে, সেগুলিকে তুমি কী চোখে দেখো?

রাহুল : কাহিনিও অনেকরকমের ইঙ্গিতের জন্ম দেয়। আমার খুব প্রিয় কবি হলেন মণিভূষণ ভট্টাচার্য। তাঁর পুরো জীবনটাই কাহিনির। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীও লিখেছেন কাহিনিধর্মী কবিতা। কিন্তু তাঁর কবিতা আমার পছন্দের নয়। জীবনের যে স্রোত, গতিপথ, তার যে লড়াই, কান্না— তা অনেক বেশি পাই মণিভূষণে। ফলে মণিভূষণের যে-কোনো কবিতাতেই দেখা যাবে, কাহিনিতে-কাহিনিতে সংকেত জন্ম নেয়। এবং তা পলিটিক্যাল সংকেতধর্মী। ফলে কাহিনির মধ্যে যে সংকেত থাকবে না, তা কিন্তু নয়। আমি গল্প লিখছি না, কবিতা লিখছি। গল্প আর কবিতার মধ্যে পার্থক্য আছে একটা। একটা গল্প কবিতার মতো হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু একটা কবিতা গল্পের মতো হয়ে ওটা মুশকিলের। সমস্যা আছে। আমাদের প্রচুর কবি কাহিনি লিখেছেন। কাহিনি-কাব্য। সত্যি সেগুলো প্রণিধানযোগ্য। এবং তারমধ্যেও প্রচুর সংকেতধর্মিতা আছে। নইলে সেটা কবিতা হতে পারে না।

তন্ময় : হ্যাঁ, পাঠককে যদি কোনো জায়গায় ভাবিয়ে তোলার কোনো ক্ষেত্র থাকে। সেই ক্ষেত্রই তো কবিতার প্রাণ!

রাহুল : এবং একধরনের আচ্ছন্নতাও।

তন্ময় : ধরো, গৌতমদার (গৌতম বসু) ওই কবিতাটি— 'ধীরে, অতিধীরে, তাকে দিও, আমার বিরহ'। ওটাও তো একটা কবিতা। বাঁশবনে ললাটস্পর্শ করছে। ওটাও তো একটা দৃশ্যকল্পই তৈরি করছে। কাহিনি না বলে দৃশ্যকল্প বলাটা বোধহয় ভালো।

রাহুল : এই দৃশ্যকল্প ভীষণভাবে আছে গৌতমদার কবিতায়। ভয়ংকরভাবে আছে। গৌতমদার কবিতার আরেকটা বৈশিষ্ট্য, কাহিনির মধ্যে ঢুকতে চেয়েও ঢোকেন না। মনে হচ্ছে কাহিনি হতে পারে, কিন্তু কাহিনি নয়। 'কাহিনি' এবং 'কাহিনি

Scanned with OKEN Scanner

নয়'—ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়হীনতার এই যে খেলা, তা গৌতমদার লেখায় দারুণভাবে আছে। যেমন, 'এই জল প্রকৃত শ্মশানবন্ধু /এই জল রামপ্রসাদ সেন'। আমার মনে হয়, কয়েক হাজার পৃষ্ঠা গদ্য লুকিয়ে রয়েছে এর মধ্যে। এই যে সংকেত এনে স্থাপন করলেন, এটাও একজন কবির কাজ বলেই আমার মনে হয়।

তন্ময় : এখান থেকেই আরেকটি প্রশ্ন মাথায় এল। তুমি বললে কবিতার মধ্যে রাজনীতি লুকিয়ে থাকার ব্যাপারটা। রাজনীতি তো সর্বস্তরেই রয়েছে। জীবনের রাজনীতি, বেঁচে থাকার রাজনীতি, অস্তিত্বের রাজনীতি। তথাকথিত রাজনীতি বলতে আমরা যা বুঝি— যে জিনিস চারপাশের সমাজকে আন্দোলিত করে, পলিটিক্স। এই বিষয়টা কি কবিতায় থাকা একান্তই জরুরি?

রাহুল : না। জরুরি নয়। তবে সত্তরের দশকের সেই উত্তাল সময়টাকে মণিভূষণ ধারণ করেছিলেন লেখার মধ্যে। ফলে জরুরি না হলেও তিনি লিখতে বাধ্য। কেননা, তাঁর চারপাশে ঘটনাগুলো ঘটছে।

তন্ময় : রাজনীতির ছাপ না থাকলে কি কবি সমকালীন হতে পারেন না?

রাহুল : পারেন। বিভিন্নভাবে তিনি পারেন। তিনি কী নিচ্ছেন, সমকাল থেকে তিনি কী গ্রহণ করছেন তার ওপরে নির্ভর করে এটা। রমেন্দ্রকুমারকে কী বলবে নইলে? রমেন্দ্রকুমার তো একধরনের চিরকালীন। তিনি তাঁর সমকালীনও বটে। চারপাশে যে ঘটনাগুলো ঘটছে, তার প্রভাব তো পড়েছে লেখার মধ্যে। কিন্তু মণিভূষণে আছে সরাসরি। ফলে মণিভূষণের বাগানবাড়ি আর রমেন্দ্রকুমারের বাগানবাড়ির মধ্যে পার্থক্য আছে। কে কোন পথে হাঁটবেন, সেটা তাঁর নিজস্ব ব্যাপার। মণিভূষণের প্রচুর লেখা আছে, যেখানে রবীন্দ্রনাথের লাইন ব্যবহার করছেন। যে লাইনগুলি রবীন্দ্রনাথ অন্য অর্থে লিখেছিলেন। যেমন 'উনুন জ্বলেনি আর বেড়ার পাশেই সেই ডানপিটের তেজি রক্তধারা।/গোধূলিগগনে মেঘে ঢেকে ছিল তারা'। এই যে একটা লাইন, কোথা থেকে কোথায় নিয়ে এলেন! তারপর থেকেই এটাকে মনে হত পলিটিক্যাল লাইন।

তন্ময় : সেইসঙ্গে দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যও জরুরি হয়ে ওঠে। একটা কবিতা কারও কাছে মনে হতে পারে প্রেমের, কারও কাছে আবার দ্রোহের কবিতা। পাঠকের দৃষ্টিভঙ্গির ওপরেই হয়তো পুরোটা নির্ভরশীল।

রাহুল : পুরোটাই। আমার একটা কবিতার লাইন ছিল— 'সীমানা পেরিয়ে যাব/সাথে যাবে অস্ত্রবণিক।' এটা নিয়ে সুনীলদার বক্তব্য ছিল, 'অস্ত্রের' করতে হবে। আমার স্পষ্ট কথা, ছন্দ ভুল-টুল জানি না। 'অস্ত্রবণিক'-এর মধ্যে অসম্ভব একটা জোর আছে। এর মধ্যে রাজনীতি আছে। সেই সময়ের রাজনীতি। যারা অস্ত্রবিক্রেতা,

তাদের দিকে ইঙ্গিত। কখনও কখনও তুমি বলতে পারো, এটা রাজনীতির কবিতাই নয়। 'অস্ত্র'-কে তুমি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখা করতে পারো। কিন্তু সামান্য বোধের তারতম্যে সংজ্ঞাগুলো পাল্টে যায়। মণিভূষণ যেমন স্পষ্ট পলিটিক্যাল। সেসময় অনেকে কিন্তু স্পষ্টভাবে পলিটিক্যাল নয়। কিন্তু তাঁদের লেখার মধ্যেও রাজনীতি রয়েছে। বিশেষ করে সত্তরের কবিদের মধ্যে ব্যাপকভাবে ছিল। কারণ সেই সময়কে কেউই অস্বীকার করতে পারেননি প্রায়।

তন্ময় : এখানে একটা প্রশ্ন জন্ম নিল। তোমার প্রায় সব কবিতার মধ্যেই একধরনের ছন্দ লুকিয়ে আছে। কোনো-কোনো জায়গায় ছন্দই প্রকট। সেটা অন্ত্যমিল যে ছন্দ, তা বলছি না কিন্তু। সে-যাইহোক। তুমি কি ছন্দের কবিতা লেখার সময় বা পরে কখনও মাত্রার ওপর খেয়াল রাখো? যে, মাত্রা মিলছে না? মাত্রার চ্যুতি হল কি না? মানে কানে হয়তো মিলে যাচ্ছে কিন্তু খাতায় কলমে মাত্রা মিলছে না?

রাহুল : একসময় মাত্রার চ্যুতি হত। প্রচুর। সেটা আস্তে-আস্তে কমে গেছে।

তন্ময় : এই যে 'অস্ত্রবণিক' বললে, এখানে হয়তো 'অস্ত্রের বণিক' বললে এক মাত্রা বেশি হত।

রাহুল : একসময় গড়ে আমরা প্রায় সবাই বিশ্বাস করতাম যে, মাত্রা কোনো ব্যাপার নয়। যত বয়স হয়েছে যত শান্ত হয়েছি। এখন মনে হয় মাত্রা একটা ব্যাপার। চ্যুতি নিয়েও ভেবেছি। কিন্তু এখনও যে সে ভুল হয় না। তা নয়। শব্দের প্রেমে যদি পড়ে যাই একবার সে-শব্দ সহজে ছাড়তে ইচ্ছে করে না। তখন মনে হয় যে, মাত্রা-টাত্রার কোনো অর্থই নেই।

তন্ময় : তোমার কি তাহলে এই দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টেছে যে, কানে ঠিক থাকলেই হল, ব্যাকরণগত ব্যাপারটায় অত গুরুত্ব না দিলেও চলে?

রাহুল : আমি এখনও ব্যাকরণ খুব একটা মান্য করি না। যেটা মান্য করি, সেটুকু লিখতে-লিখতে হয়ে গেছে। কিন্তু আমি যে ভীষণভাবে ছন্দ জানি তাও নয়। পার্থপ্রতিম যে অর্থে ছন্দ জানেন, আমি জানি না। জানি না মানে, আমার ছন্দশিক্ষার প্রয়োজন পড়েনি কখনও সেই অর্থে। আমার মনে হয়, যে-লেখা আসছে সে নিজেই তার পথ করে নেবে। ফলে জোর করে ছন্দ শেখার মধ্যে একটা ফাঁদও আছে বিরাট। তুমি ছান্দসিক হবে, না কবি হবে? আসলে লিখতে-লিখতে একধরনের ধাঁচা তৈরি হয়। তখন মনে হয় যে, 'অস্ত্রের' লিখলে মাত্রা মিলে যাচ্ছে। মিলে গেলে সেটা তো অস্বীকার করতে পারি না। কিন্তু এখনও আমি কানকেই মূলত প্রাধান্য দিই।

তন্ময় : তুমি আমাকে একসময় বলেছিলেন, যে-কোনো শিল্পই প্রবল জনপ্রিয় হওয়া সন্দেহজনক। যে কবিতার প্রচুর পাঠক, তাকে সন্দেহ করা উচিত। কারণ শিল্প সবসময় কম মানুষের জন্য। একটা নির্দিষ্ট মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এটা কেন মনে হয়েছিল?

রাহুল : কম মানুষের জন্য নয়। কিন্তু একটা প্রবণতা তৈরি হয় একসময়, যে, সবাই কবিতা লিখছে, সবাই কবিতা পড়ছে, বুঝছে, লক্ষ লক্ষ কপি বিক্রি হচ্ছে। তখন মনে হয় এমন। কবিতা একটা আবছা জিনিস। সেটা স্পষ্টভাবে কারও কাছে ধরা দেয়, কারও কাছে দেয় না। কবিতার সঙ্গে জনপ্রিয়তার কোনো সম্পর্ক নেই। কবিতা তো জনপ্রিয় বস্ত্রালয় নয় সেই অর্থে। কবিতা মানুষের বেঁচে থাকা। তার বেঁচে থাকাকে তুমি স্পর্শ করছ। সে-স্পর্শ যদি ভীষণ জনগ্রাহ্য হয়, তাহলে আমার নিজের মনে হয় স্পর্শের চরিত্র নষ্ট হয়। তাঁ অস্তিত্বের যে চরিত্র, তা নষ্ট হয়। এটা আমার নিজস্ব বোধ। কিছু বই হাজার হাজার কপি বিক্রি হয় বাজারে। কিছু বই ২০ বা ৩০ কপিও বিক্রি হয় না। কিন্তু তা অনেকেই জেরক্স করে পড়েন। পার্থক্য আছে দুইয়ের মধ্যে। যখন কোনো কবিতার বইয়ের হাজার-হাজার কপি বিক্রি হয়, তখন সন্দেহ জাগে মনে। বাংলা কবিতার হাজার-হাজার পাঠক আছে? থাকলে তো ছবিটা অন্যরকম হত। সেই কারণে বিষয়টা বিসদৃশ লাগে।

তন্ময় : তার কারণ কি এটা, যে, একটা নির্দিষ্ট শ্রেণির কবিতার গঠনধর্ম বা চলনধর্মই মানুষকে বেশি আকৃষ্ট করে?

রাহুল : একটা সময় পরে আমাদের বাণিজ্যিক কাগজগুলো পাঠক পাওয়ার জন্য যা শুরু করল। তার পিসি, মাসি, দিদিমা বা প্রেমিকার টিপ এগুলো নিয়ে কবিতা লেখা শুরু হল। বাংলা কবিতায় যা ছিল— অস্তিত্ব নিয়ে লেখা, সেটা থেকে মানুষ অনেক দূরে সরে গেল। জন্ম নিল ছন্দ দুলে-দুলে পড়তে পারা কবিতা। আবৃত্তিকাররা আরও হৃষ্টপুষ্ট হয়ে উঠলেন। আবৃত্তিকাররা পৃথিবীর অন্য দেশে অন্য ভাষায় আছেন কিনা, আমি জানি না। তাঁদের জন্য কবিতা লেখা হল। আবৃত্তিকাররা যে-কবিতা পড়েন আর যে-বইয়ের হাজার-হাজার কপি বিক্রি হয়, তারমধ্যে মিল আছে। শুভ দাশগুপ্ত বলে একজন এসেছিলেন। তাঁর বই প্রচুর বিক্রি হত। তাঁর বই উল্টে-পাল্টে দেখেছি, কেন বিক্রি হয় বুঝতে। কবিতার ক-ও খুঁজে পাইনি। এটা আমার অশিক্ষা হতে পারে। কিন্তু এই যে আবৃত্তিকার বলে যে শ্রেণি জন্মাল, সেই শ্রেণি বিনোদনশিল্পী মূলত।

তন্ময় : আবৃত্তির আড়ালেও তো কাহিনিকথনই লুকিয়ে থাকে। আবৃত্তির আড়ালেও কবিতার শরীরে গল্প রয়ে যায় না কি?

রাহুল : যে গল্পটা লোকে খাবে।

Scanned with OKEN Scanner

তন্ময় : যেমনটা পাঁচালির ধর্ম ছিল। মানুষ খেত।

রাহুল : হ্যাঁ। যেটা লোকে খাবে। এই আবৃত্তিও কিন্তু খুব একটা জোরালো ব্যাপার। গ্রামে অনেকে আছেন এমন। এসে বলতেন, একটা আবৃত্তি লিখে দেবেন? যত মানুষ কবিতা পড়ে তারচেয়ে অধিক মানুষ আবৃত্তি করে। বীতশোক ভট্টাচার্যের কবিতা যদি আবৃত্তি করা হয়, কেউ তা শুনবে না। বুঝবেই না প্রথমত। ফলে ওই শুভ দাশগুপ্ত পড়তে হবে তাঁকে।

তন্ময় : তাহলে কি একটা সরলরৈখিক সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় যে, কবিতার জনপ্রিয়তার সঙ্গে তার কাহিনিধর্মিতা লুকিয়ে, এবং সেটা রীতিমতো উচ্চকিত?

রাহুল : সেটা তো একধরনের আছেই। এখন জনপ্রিয়তম কবি যাঁরা রয়েছেন, লক্ষ করে দেখবে, তাঁদের কবিতায় এই প্রবণতা রয়েছে। অবশ্য জয়দাকে এর মধ্যে ধরছি না।

তন্ময় : কিন্তু ওঁর-ও যে-কবিতা আবৃত্তি হয়, সেগুলো সবই কি 'কবিতা'?

রাহুল : সেগুলো আমার খুব-একটা পছন্দের কবিতা নয়। ওই কবিতাগুলো থেকে আমি দূরেই থাকি। ওঁর অসামান্য বই আছে 'এক' বলে। কোনোদিন কোনো আবৃত্তিকার পড়তে পারবেন না। 'এক' একা একা বসে নিবিড়ভাবে পড়ার বই। এই হচ্ছেন জয় গোস্বামী। আবার কোনো কবি, কেউ মারা গেলেই সঙ্গে-সঙ্গে কবিতা লিখতে বসে যায়। বা কোনো ঘটনা ঘটলে, সঙ্গে-সঙ্গে কবিতা লিখতে বসে গেল। ব্যাপারটা খুব ইন্টারেস্টিং। এমন ঘটনা ঘটেছিল শঙ্খ ঘোষের ক্ষেত্রেও। শঙ্খ ঘোষ একসময় অরুণেশ ঘোষকে একটা সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন— 'অবচেতন হল কবিতার ধাত্রী।' কিন্তু মৃত্যুর আগে প্রায় তিরিশ বছর ধরে যে লেখাগুলি তিনি লিখে গেলেন, তার অনেকগুলোই সচেতন কবিতা। অবশ্য তা সময়ের দাবি মেনেই, তাতে সন্দেহ নেই। শঙ্খ ঘোষ আমার খুব প্রিয় কবি। কিছু-কিছু কবিতা ভোলা যাবে না। কিন্তু গত তিরিশ বছর ধরে যে লেখাগুলি লিখে গেলেন তিনি সচেতনভাবে, 'অবচেতন কবিতার ধাত্রী'—এর অর্থ থেকে সরে গেলেন আর কী। এই সরে আসাটা কি সময়ের প্রয়োজন? নাকি অন্যকিছু? আমি ঠিক ঠাহর করতে পারি না।

তন্ময় : তোমার কি এই জিনিসটা মনে হয় না, যে, অনেক পাঠক যাঁরা হয়তো বই পড়েন (কবিতার বই বলছি না), পড়তে চান। সেটা যে-কোনো বই হতে পারে। তাঁরা কবিতার থেকে দূরে-দূরে থাকতে চান। কারণ কবিতা তিনি বোঝেন না, কঠিন বলে দাগিয়ে দেন। একটা ভালো কবিতার ভিতরে প্রবেশ করার জন্য পাঠকেরই কি সর্বাগ্রে প্রস্তুত হওয়া উচিত নয়?

Scanned with OKEN Scanner

রাহুল : একদম। একশোবার। কবিতা সবার জন্য নয়। কবিতার জন্য প্রস্তুতির প্রয়োজন হয়। লেখার জন্য যেমন প্রস্তুতির প্রয়োজন হয়, ঠিক তেমনি পড়ার জন্যেও। তুমি নির্মল হালদার খুব সহজে পড়ে একরকম মানে করতে পারো। আবার যখন মৃদুল দাশগুপ্ত পড়বে, তখন মনে হবে না অত সহজ। কী বলতে চাইছে! বীতশোক পড়ে মনে হবে, ওরে বাবা, এ তো আরও কঠিন! আমার নিজের মনে হয় যে, পাঠক তৈরির-ও একটা সিলেবাস থাকা দরকার।

তন্ময় : পাঠকের তৈরির, না কবির পাঠক তৈরির?

রাহুল : পাঠক তৈরির। কবিতার পাঠক তৈরির। সেটা আমাদের এখানে নেই। শংকর আমরা যেভাবে পড়ি, ঠিক তেমনভাবে আমরা জীবনানন্দ দাশ পড়ি। পড়ার চেষ্টা করি। ফলে যা হওয়ার, তা হয়।

তন্ময় : শৈশব, কৈশোরে আমাদের যেভাবে কবিতা পড়তে শেখানো হয়, তার মধ্যেই সমস্যা লুকিয়ে। একটা কবিতার মধ্যে যদি কোনো দুরূহ লাইন থাকে, সহায়িকা বই দিয়ে তার ব্যাখা করে দেওয়া হয়। আমরা যাতে সহজে সমস্তটা বুঝে যাই। গদ্যের আকারে ব্যাখা করা হয়। কাজেই, পরবর্তীকালে যে একটু বেশি পরিশ্রম করবে না, তার কাছে শুধু কবিতা পড়ে বোঝা কঠিন হয়ে যায়। তার কাছে কোনো মানে বই থাকে না। তখনই উঠে আসে 'এই লাইনটা বুঝিয়ে দিন'— এমন কথা। তোমাকে নিশ্চয় সারাজীবনে অনেকবার এ প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়েছে?

রাহুল : আমার ছেলেকে দিয়ে বলি। আমার ছেলে খুব ইন্টারেস্টিং ছবি আঁকত। খুবই ভালো। তারপর একদিন দেখলাম যে, ছবি আঁকায় অনেক ভুলচুক হচ্ছে। কী ব্যাপার? দেখলাম, ছবি আঁকার মাস্টারমশাই এসেছেন বাড়িতে। মাস্টারমশাই ওঁর মতো ছবি আঁকা শেখাচ্ছেন— এটা বল, এটা সাইকেল। আগে ও যে সাইকেল আঁকত, দেখে তাজ্জব বনে যেতাম। এমনভাবে ও ভাবল কী করে! এখন সে সাইকেলের মতো সাইকেল আঁকে। সবকিছু ব্যাখ্যা করে দেওয়া হয়। ফলে ব্যাখ্যাকারের চোখ দিয়ে আমি দেখি। নিজের চোখ দিয়ে আমি দেখি না। একজন পাঠক কবিতাকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে অর্থ করতে পারেন। কিন্তু নোটবইগুলিতে যাঁরা ব্যাখ্যা করেন, তাঁরা ধরে-বেঁধে বোঝান— এটার মানে এই। ফলে সমস্যা তৈরি হয়। অন্ধকারের জায়গা তৈরি হয় একটা।

তন্ময় : তোমাকে নিশ্চয় বিভিন্ন সময়ে এ-প্রশ্নের সম্মুখে পড়তে হয়েছে, যে, এই লাইনটা কেন ব্যবহার করলেন? এটার মানে বুঝতে পারছি না! এটা একটু বুঝিয়ে দিন। তখন কীভাবে সামাল দাও?

রাহুল : আমার খুব সহজ উত্তর আছে। এগুলো তো সব আমার লেখা নয়। আমার লাইন আসে। তো যেখান থেকে আসে, যিনি পাঠান, তিনিই জানেন।

তন্ময় : প্রসঙ্গ পাল্টাই এবার। প্রথম দশকের কবিতা সম্পর্কে তোমার পর্যালোচনা কী? এই দশকের কোনো নিজস্বতা কি রয়েছে? নাকি পূর্বজদের পুনরাবৃত্তিই হয়ে গেল?

রাহুল : না না। পুনরাবৃত্ত যে খুব হয়েছে, তা নয়। প্রত্যেক দশকেই প্রচুর লোক লিখতে আসেন একসঙ্গে। তারপরে তিন-চার দশক পরে দেখা যায় এক-দুই-তিন-পাঁচ-দশজন টিকে আছেন। পুনরাবৃত্তি করে টিকে থাকা যায় না। প্রথম দশকে অনেক ভালো লেখা হয়েছে। আর, যেটা খুব ইন্টারেস্টিং বলে মনে হয়, যে, এখন তো একটা অদ্ভুত সময়। অস্থিরতা সেভাবে চোখে পড়ে না। সবকিছু গা-সওয়া হয়ে গেছে। আমরা অনেকবেশি আন্তর্জাতিক হয়ে উঠেছি। এইসময়ে যাঁরা লিখতে আসছেন, তাঁদের জন্য লেখালিখি কঠিন একটা বিষয়। কারণ প্রাকৃতিক সারল্য প্রায় নেই। মানসিক সারল্যও হারিয়েছে। সেখানে কবিতা লেখা খুব দুরূহ। সেটা তাঁরা কিন্তু পেরেছেন।

তন্ময় : সোশ্যাল মিডিয়ায় কবিতাচর্চার খারাপ দিক সম্পর্কে সবাই মোটামুটি ওয়াকিবহাল। এবং তা নিয়ে আলোচনাও চলে। তুমি কি এর মধ্যে ভালো কিছু দেখো?

রাহুল : হ্যাঁ। ভালো দেখি। মাঝে-মধ্যে ভালো কিছু লেখা পড়ি। হঠাৎ-হঠাৎ করে একজন লেখককে আবিষ্কার করা যায়। সে বই হয়তো আমি এমনিতে পেতাম না। অন্যদিকে, ফেসবুকে কবিতার আমি একধরনের বিরোধী সে-অর্থে। লাইক-ফাইক দেখে অস্বস্তি লাগে। কিন্তু এর একটা ভালো দিক হচ্ছে, অনেকের নাম শোনা যায়। জানা যায়, অমুকে লিখছে হয়তো। উৎপলকুমার হয়তো আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে লিখেছেন কবিতা। সে-কবিতা হয়তো আমার পড়া নেই। কেউ হয়তো পোস্ট করলেন। এটুকুই এর প্রাপ্তি।

তন্ময় : এ-প্রসঙ্গে আরেকটা কথা বলতে চাই। সোশ্যাল মিডিয়ার কারণে আরেকধরনের হীনমন্যতাও তৈরি হয়েছে অনেকের মধ্যে। অমুকের কবিতা একশো-দেড়শো-চারশো লাইক পাচ্ছে। আমার কবিতা হয়তো দশ-পনেরোটা লাইক পাচ্ছে। তার মানে কি আমি লিখতে পারি না? এমন মানসিকতা অনেকের মধ্যেই দেখি।

রাহুল : হয় তো। শুধু তাই নয়। একটা গল্প বলি। একবার শঙ্খবাবু আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন— তুমি কবিতা পড়তে যাও না কেন? বলেছিলাম, আমার খুব ভয় করে। জয়দেব উঠল কবিতা পড়তে, মল্লিকা উঠল। ওরা প্রচুর হাততালি পায়। আমি যে কবিতা পড়ি, তাতে কেউ হাততালি দেয় না। তারপর তিনদিন ভালো করে ঘুম হয় না আমার রাতে। এখন তো শুনি, কবিতা বুস্ট করার জন্য লোকে পয়সা খরচ করে। লোক রাখে বই বুস্ট করার জন্য। এই যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেছে, এটা খুব খারাপ দিক। আমরা আস্তে-আস্তে সেই খারাপের শিকার হচ্ছি।

Scanned with OKEN Scanner

তন্ময় : আগেকার দিনে হাততালি দিয়ে চারপাশের মানুষ বিচার করত— 'ওরে বাবা, ও হাততালি পাচ্ছে। তাহলে আমি না বুঝলেও ও নিশ্চয়ই বড়ো কবি!' এখন পাঁচশোটা লাইক! তাহলে নিশ্চয়ই বিরাট কিছু।

রাহুল : একটা গল্প বলি। একজন লোক, বাঁকুড়া না বীরভূমের ঠিক মনে নেই, আমাকে একবার বলেছিল, 'দাদা, তাঁলিয়া চাই কবিতায়।' জিজ্ঞেস করলাম, 'কীসে তালিয়া হয়?' বলল— 'তিনদিন খেতে পায়নি। গুলি ছুঁড়েছে। তারপর বলতে হবে ইনকিলাব জিন্দাবাদ। তারপরে বলতে হবে ভেঙে দাও গুঁড়িয়ে দাও। তাহলে তাঁলিয়া পাবেন।' তাঁলিয়া খুব সংক্রামক একটা জিনিস। একজন লেখক যখন তালি পেয়ে যায়, সে ওই তালির পেছনে ছোটে। তাই তালি থেকে দূরে থাকাই মঙ্গল।

তন্ময় : তথাকথিত এই তালি যখন কোনো কবি পান না, তিনি সেটাকেই 'আমি তালি পাওয়ার কবিতা লিখি না' বলে অহংকার করেন, সেটাকেই তালি ভেবে তৃপ্ত হন। নয় কি?

রাহুল : সে অন্যভাবে তালি চায়। আমি একবার ভাষানগরের আড্ডার গোলটেবিলে বলেছিলাম, আমার কবিতা যদি প্রচুর লোকে পড়ে তাহলে আমি সন্দেহ করব। কারণ প্রচুর লোকের জন্য আমি কবিতা লিখতে পারি না। হয় না। আমি আস্তে-ধীরে শান্ত মনে কবিতা লিখছি। তা দশ-পনেরোজন পড়তে পারে। আমাকে মল্লিকা বলেছিল 'জনপ্রিয় হলে তুই খুশি হবি না?' আমি বললাম, খুশি হব না কেন? খুশি তো হব। কিন্তু নিজেকে সন্দেহও করব। কী লিখছি আমি? এত পাঠক পড়ছে। বহু বই বিক্রি হচ্ছে আমার। একটা ভালোলাগা থাকবেই। কিন্তু নিজের প্রতি সন্দেহটাও বাড়বে আস্তে-আস্তে।

তন্ময় : এমন অনেকেই ছিলেন চল্লিশ-পঞ্চাশের কবি, যাঁরা হয়তো সমসময়ে অত্যধিক বন্দিত, এখন তাঁদের লেখা প্রায় কেউই পড়ে না।

রাহুল : হারিয়ে গেছে। বেশিরভাগই তাই। এখনও আছে তেমন। বিরাট গোষ্ঠী। বিরাট দাপট। কিন্তু তাঁর লেখা তেমন কেউ পড়ে না। তাঁদের বন্ধু-বান্ধবী পিঠ চাপড়ায়। এগুলো ফেসবুক খুললে বোঝা যায়। কিন্তু তিনি কেন লিখছেন, এটা বোঝা যায় না। দ্বিতীয়ত, পঞ্চাশ বছর কবিতা লেখার পরেও, একজন কবি যদি ছন্দ না জানেন, তবে কি তার কবিতা লেখা উচিত? তিনি তো লেখাই শেখেননি। লেখাটাও তো শেখার বিষয়। মাত্রা সবসময় ঠিক থাকবে, তা নয়। একটা লেখা পড়ে বোঝা যায়, তিনি কিছু জানেন কি না। যদি তুমি না জানো কিছু, তাহলে লিখে লাভটা কী? ফলে পঞ্চাশ-ষাট বছর কবিতা চর্চার পরে তাঁর লেখা আর পড়া যায় না।

Scanned with OKEN Scanner

উৎপল দত্তের 'টিনের তলোয়ার'-এ আছে, একসঙ্গে অনেকবছর অভিনয় করার পর একদিন একজন অভিনেতা বুঝতে পারলেন, তিনি নাটকের কিছুই জানেন না। তাঁকে বলা হল, তাহলে আপনি নাটক ছেড়ে দিলেন না কেন? উত্তরে বললেন— 'ততদিনে তো আমি মহানায়ক হয়ে গেছি।' এই যে তুমি একটা কুলপতি হয়ে আছ, কবিতার ক্ষেত্রেও এখন এমন অনেককিছু হয়। একটা সময় মানুষ লজ্জায়-লজ্জায় বলত, আমি কবিতা লিখি। কবিতা লিখছ মানে তুমি অকর্মণ্য। এখন কবিতা লিখে সভাপতি হতে পারছ। এম.এল.এ, এম.পি হতে পারছ। একটা সামাজিক দাপট দেখাতে পারছ। কিন্তু আমার নিজের ধারণা হচ্ছে যে, যত তুমি ক্ষমতার কাছাকাছি যাবে, তত কবিতা তোমার থেকে দূরে সরে যাবে আস্তে-আস্তে।

তন্ময় : এখনকার আরেকটা প্রবণতা হল— 'তুমি কবিতা লেখো? তোমার বই আছে? আমার অমুক আত্মীয়ও তো কবিতা লেখে।' এমন ব্যাপারস্যাপার কি তোমার সময়েও ছিল?

রাহুল : আমাদের সময়ে অতটা ছিল না। কবিতা লিখি। তবে মাঝে-মাঝে শুনতে হত— 'কবিতা লেখো? তুমি কবি হবে?' এমন ব্যঙ্গ ঘোরাফেরা করত।

তন্ময় : বাংলা কবিতার পাঠক কম— এ-অভিযোগ তো বরাবরেরই। তুমি গত চার দশকে নিশ্চয়ই আরও হ্রাস পেতে দেখেছ? এর কারণগুলো কী কী বলে তোমার মনে হয়?

রাহুল : আমার মনে হয়, কমেনি। বরং বেড়েছে। এখন যেমন প্রচুর বই বেরোয়, আমাদের সময়ে এত বই বেরোত না। আমি যখন লিখতে এসেছিলাম, তখনও বই বেরোত, তবে এত অধিক সংখ্যক নয়। আরেকটা ইন্টারেস্টিং জিনিস এই, যে, আমাদের সময়ে একসঙ্গে হয়তো কুড়িজন লিখতে এলেন। চার-পাঁচ বছর পরে সংখ্যাটা দাঁড়াল পাঁচজনে। এখন যদি কুড়িজন লিখতে আসেন পাঁচ বছর পরে অন্তত পনেরোজন টিকে যান। লেখেন তাঁরা। বই বার করেন। তাঁর বই বিক্রিও হয়। তরুণ কবির বই বিক্রি, আমার ধারণা, বেড়েছে। বিভিন্নভাবে। ছোট-ছোট প্রকাশনা কত বই বের করে আজকাল। আমাদের সময়ে কোনো-কোনো প্রকাশনী রাঘব বোয়ালের মতো গিলে খেত সমস্ত। সেই প্রকাশনীর কাগজে না লিখলে তুমি কবি নও। সেই প্রকাশনী থেকে তোমার বই না বেরোলে তুমি কবি নও। এই যে মৌরসিপাট্টা, তা নষ্ট হয়ে গেছে। এবং নষ্ট হয়ে যাওয়াতে প্রচুর ভালো-ভালো প্রকাশনী হয়েছে। এবং তারা তরুণ কবিদের বই বার করছে। এটা একটা ভালো লক্ষণ। আমার মনে হয়, এর ফলে কবিতার পাঠক বাড়ছে।

Scanned with OKEN Scanner

তন্ময় : এর জন্য তো গত দশ বছরের সোশ্যাল মিডিয়াও দায়ী?

রাহুল : হ্যাঁ, দায়ী। কত ভালো-ভালো বইয়ের বিজ্ঞাপন দেখি। ধরো, বাংলাদেশের একটি বই। বাংলাদেশেও অনেক ভালো-ভালো লেখক আছেন। জানতাম না আমরা কিছুই। আগে দু-তিনজনের নাম জানতাম। এখন আস্তে-আস্তে লেখা পড়ে, বিজ্ঞাপন দেখে, রিভিউ দেখে জানতে পারি অনেক লেখকের কথা। ফলে বাংলা কবিতার পরিধি আরও বিস্তৃত হয়েছে। কোনো কবিতা পাঠকের বাড়ি তুমি যদি যাও, দেখবে সেখানে দুই-একটা বাংলাদেশের বইও আছে। তাঁরা জোগাড় করেন। আমাদের সময়ে ছিল না এগুলো। জানতাম আল মাহমুদ, শামসুর রহমান এঁরাই কবি।

তন্ময় : আবার প্রসঙ্গ বদলাই। কোনো নির্দিষ্ট শব্দ, নাকি একটি সম্পূর্ণ বাক্য— কবিতায় কোন জিনিসটা বেশি অভিঘাত তৈরি করে বলে তোমার মনে হয়?

রাহুল : শব্দ। একটা শব্দের জোর মারাত্মক। সেই জোরটা আবিষ্কার করা পাঠকের কাজ। পাঠক শব্দকে অন্যভাবে দেখেন পুরো। একটি কবিতার লাইনের মধ্যে লুকিয়ে থাকা শব্দকে আবিষ্কার করার আনন্দই আলাদা।

তন্ময় : তুমি তথাকথিত বিগ হাউসের পত্রপত্রিকায় তেমনভাবে লেখোনি কোনোদিন। নিজেকে কি প্রতিষ্ঠানবিরোধী বলে দাবি করো?

রাহুল : একেবারেই না। 'দেশ' আমার কাছে লেখা চায়নি সেভাবে। যখন সাগরময় ঘোষ আমার আর জয়দেবের কাছে কবিতা চেয়েছিলেন, আমি তখন দিতে পারিনি। জয়দেব দিয়েছিল। তারপরে জয় গোস্বামী যখন কবিতা বিভাগের সম্পাদক হন, লেখা চেয়েছেন। দিয়েছি। প্রতিষ্ঠানবিরোধিতা বলে কোনো কিছু নেই আমার কাছে। কিন্তু 'দেশ'-এ লিখে তেমন আনন্দ পাইনি, যতটা আনন্দ পেয়েছি 'প্রতিক্ষণ'-এ লিখে। আমাদের সময়ে 'প্রতিক্ষণ' বলে একটি কাগজ ছিল। 'কবিতাকথা' বলে একটি লিটল ম্যাগাজিন ছিল। এগুলো ছিল কবিতার কাগজ। এগুলোতে লিখতে পারলে আনন্দে ঘুম হত না রাতে। অনেক কবিতা ছাপতেন ওঁরা। ফলে আমাদের কাছে অন্য রাস্তা ছিল। 'দেশ'-এ লিখতে পারছি না, বা লেখা চাইছে না ওরা, এতে খুব একটা প্রভাবিত হইনি।

তন্ময় : কবিতাপাঠের মঞ্চ, অনুষ্ঠান, পুরস্কার ইত্যাদি তরুণ কবির পক্ষে ভালো না খারাপ?

রাহুল : খুব খারাপ! খুব! আমাদের সময়ে দেখতাম 'আনন্দ পুরস্কার' পাচ্ছেন শঙ্খবাবু, শক্তিদা। তারপরে একটা সময়ে দেখলাম যে, যারা সবে লিখতে এসেছে তারাও পেতে শুরু করেছে। এতে আসলে পুরস্কারের মানটা নেমে যায়। যিনি পাচ্ছেন

তাঁর লাভ হয়, তিনি বিখ্যাত হন। কিন্তু পুরস্কারের মানটা নষ্ট হয়ে যায় একরকম। দ্বিতীয়ত, লোভ জন্ম নেয় একটা। মঞ্চে উঠে কবিতা পড়ে হাততালির লোভ। এসব থেকে যতদূরে থাকা যায়, আমার মনে হয় ততই ভালো। ভালো বললে সবারই শুনতে ভালো লাগে। কিন্তু হাততালি খুব সংক্রামক ব্যাধি।

তন্ময় : কখনও লেখা না এলে আমাদের অনেকেরই ভয় করে যে, এই বুঝি হারিয়ে গেল। আর বোধহয় হবে না। এই ভয়টা কি যুক্তিযুক্ত? নাকি অপেক্ষা করাই একমাত্র পথ? সময়ের হাতে ছেড়ে দেওয়া? 'ফুরিয়ে গেলে যাবে'— এমন ভাবা উচিত?

রাহুল : ফুরিয়ে গেলে যাবে। কিছু তো করার নেই। আমার নিজের বিশ্বাস, কবিতা ছেড়ে যায়। একজন কবি কখনও কবিতাকে ছাড়তে পারেন না। কবিতা তাকে ত্যাগ করে। সমর সেন কবিতা লেখা ছেড়ে দিয়েছেন, এ আমি বিশ্বাসই করি না। আমার মনে হয়, সমর সেনের আর কবিতা আসত না। সমর সেন 'ফ্রন্টিয়ার' করে যে পৃথিবীতে চলে এলেন, সেটা বড্ডো বেশি অন্যরকম। কবিতার মুখোমুখি হওয়ার তেমন অবকাশ ছিল না তাঁর কাছে। ফলে তিনি লেখেননি নয়, লিখতে পারেননি। পারেননি মানে কবিতা আসেনি তাঁর কাছে। কবিতা না এলে তিনি লিখবেন কীভাবে! আমার এটা মনে হয়, কবিতা যখন ছেড়ে যায় তুমি মাথা কুটেও লিখতে পারবে না।

আর যদি না যায়, তুমি যে অবস্থাতেই থাকবে, তোমাকে লিখিয়ে ছাড়বে সে। নিজের লেখাগুলো ফিরে পড়লে মনে হবে, এই লাইন আমি লিখলাম কী করে? এই চিন্তা মাথায় এল কীভাবে আমি ভাবতে পারি না। আমার মনে হয়, যে-লেখে সে অন্য কেউ হয়তো। তুমি মাধ্যমমাত্র।

তন্ময় : কবিতার বহুপ্রজতাকে তুমি কী চোখে দেখো? কেউ যদি প্রচুর লেখেন, সেক্ষেত্রে?

রাহুল : আসতেই পারে। আমি কোনো অন্যায় দেখি না। অনেকে আছেন, যাঁরা প্রচুর লিখতে পারেন। প্রচুর। তাতে কিছু যায়-আসে বলে আমার মনে হয় না।

তন্ময় : কোনো কবির কাছাকাছি সময়ের একাধিক লেখায় তো বিষয়েরও আংশিক ছাপ পুনরাবৃত্ত হয় অনেকসময়। সেক্ষেত্রে, প্রত্যেকটি লেখাই স্বতন্ত্রভাবে হয়তো ভালো লাগতে পারে, কিন্তু যখন সেগুলো পরপর পড়ছ, তুমি কি সেটাকে পুনরাবৃত্তি হিসেবে দেখবে না একটা নির্দিষ্ট ফেজের লেখা বলেই ভাববে?

রাহুল : না না। তার আধারটা কী, সেটা সবচেয়ে বড়ো প্রশ্ন। একটা আধারে এসে তার শব্দ, বিষয় তো পাল্টে যায়। সে অন্য রূপ ধারণ করে। আমার খেয়াল থাকবে, সে-লেখা অন্য কোনো চেহারা নিচ্ছে কি না। সে অন্য বার্তা নিয়ে আসে কি না। অন্য কিছু বলতে চায়, নাকি চায় না। সেটা আমার কাছে বেশি গ্রহণীয়।

Scanned with OKEN Scanner

তন্ময় : কবিতা লেখা আর তার প্রকাশের মধ্যবর্তী দূরত্বটা কতটা প্রয়োজনীয়? এবং একজন তরুণ কবি তা কীভাবে বজায় রাখবেন? কারণ, এখন লেখার সঙ্গে-সঙ্গে সবার সামনে তুলে ধরার সুযোগ বা মাধ্যম আমাদের সবার হাতেই আছে। অপেক্ষার কোনো জায়গা তেমন নেই। মানে চাইলে পারি, না চাইলে না-ও পারি।

রাহুল : আসলে কবিতা লেখাটা আর প্রকাশ করাটা নিজের সঙ্গে একটা লড়াই। আমি কী চাই, আমি কি লিখতে চাই? আমি যে লেখাটা লিখেছি সেটা কি প্রকাশযোগ্য? এই নিয়ে তুমি যদি সন্দিহান থাকো, তাহলে ছাপবে না। তুমি যদি মনে করো দারুণ লেখা লিখেছি আমি, তাহলে তুমি ছাপতে দেবে। এটা অনেকটা মানসিকতার ওপর নির্ভর করে। তবে আমার নিজের মনে হয়, বাংলা কবিতার বয়স তো অনেক হল। প্রচুর ভালো-ভালো কবিতা লেখা হয়েছে একসময়। কাজেই কবিতা লেখাই যায়, কিন্তু প্রকাশ করাটা চ্যালেঞ্জিং। আমি নতুন কিছু যদি না প্রকাশ করতে পারি, নতুন কিছু যদি না বলতে পারি, তাহলে আমি কী করলাম!

তন্ময় : তোমার লেখা, লেখার পরে প্রকাশ হওয়া এবং প্রকাশ হয়েছে কিন্তু গ্রন্থিত করোনি— এরকম অনুপাত কেমন? বা, এরকম কি তুমি করে থাকো?

রাহুল : প্রচুর লেখা আছে এমন। হয়তো লিখেছি, কিন্তু কোনো পত্রিকাতে বা বইতে ছাপতে পাঠাইনি। আরেকজনের কথা বলতে পারি। পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল। পার্থদা যা কবিতা লিখেছেন সারাজীবন, তাতে ওঁর কবিতাসমগ্রের সমান আরও তিনটে কবিতাসমগ্র বেরিয়ে যেতে পারে। কিন্তু সেগুলো নেই। তিনি নিজেও চাননি, থাকুক।

তন্ময় : একটা বিতর্কিত বিষয়ে আসি। অনেকে বলেন, কবির কাজ শুধুমাত্র কবিতা লেখা। সেই বইয়ের প্রচার, বিপণন ইত্যাদির দায়িত্ব প্রকাশকের। কবি ওসব ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। কিন্তু বাস্তব খানিকটা অন্য। আমাদের ভাষায় কবিতার বই যাঁরা বার করেন, সেটা বিগ হাউস হোক কিংবা লিটল ম্যাগাজিনের প্রকাশনা— তাঁরা যে-কোনো বই তো বটেই, কবিতার বইয়ের ক্ষেত্রেও অনেকসময় ব্যর্থ হন সম্ভাব্য পাঠকের কাছে পৌঁছে দিতে। ফলে, কবির নিজের বইয়ের প্রচার বা বিপণনে জড়ানো উচিত নয়, কবির কাজ শুধু লেখা— এই ব্যাপারটাকে তুমি কী চোখে দেখো?

রাহুল : একটা সময় পর্যন্ত আমি মনে করতাম, উচিত নয়। কিন্তু বাস্তবতা আমাদের অন্য দিকে ঠেলে দিয়েছে। তোমার বইটা যে করছে, সে বিপণন না করলে বইটা আর বিক্রি হবে না। পড়ে থাকবে। সে আর জীবনে তোমার বই করবে না। আমার মনে হয়, একজন কবির নিজের বইয়ের জন্য নয়, পরবর্তী একজন তরুণের কবিতার

বই যেন বেরোতে পারে সে-পথটা তৈরি করা দরকার। যে তৈরি করছে, তাকে নিজের বইটা সম্পর্কেও বলতে হবে। এর মধ্যে কোনো দোষও দেখি না। চোখে লাগে অবশ্য। আমিসর্বস্বতা খুবই অস্বস্তিকর একটা ব্যাপার। কিন্তু আমিসর্বস্বতার বাইরে দাঁড়িয়ে যদি করা যায়, তাহলে তার মধ্যে অন্যায় কিছু আছে বলে মনে হয় না।

তন্ময় : কমবয়সে, অন্তত কুড়ির কোঠায় যাদের বয়স, তাদের অনেকেই কবিতা লেখার নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে প্রাথমিকভাবে জীবিকার চিন্তাকে পিছনে ঠেলে দেয়। তারপরে সে যদি কোনো জীবিকাতেও ঢোকে, দেখা গেল তার লেখালিখি আর পেশা হয়তো দুই ভিন্ন মেরুর। অনেকক্ষেত্রে জীবিকা মানুষকে এমন শুষে নেয় যে, তারপর কবিতা লেখার মতো মানসিক স্থিরতার জায়গাটা আসে না। কবিতা লিখতে চায় এমন একজন এই লড়াইটা কীভাবে জয় করবে?

রাহুল : তাকে সবার আগে নিজের সঙ্গে লড়াই করতে হবে। আমার কথাই ধরো। আমি জীবনে যে চাকরি-বাকরি করেছি, অধিকাংশই হল মিডিয়াকেন্দ্রিক। মিডিয়াতে মজা পেতাম একসময়। বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে যেতে পারতাম। প্রচুর লোকের সঙ্গে মিশতাম। যেগুলি কোনো-না-কোনোভাবে প্রভাব ফেলেছে আমার লেখার মধ্যে। তা না হলে হয়তো লিখতে পারতাম না।

পরবর্তী সময়ে আমি আমার চারপাশটাকে গুছিয়ে নিতে পারি। এর ফলে একটা সমস্যা হয়। আমার চাকরি চলে যায়। খুব খারাপ অবস্থায় থাকি। কিন্তু আমার এ-ব্যাপারে বিশেষ কোনো আপশোস নেই। কিন্তু আমার সবসময় একটা কথা মনে হয়। প্রতিকূলতা যদি চাপাও, তা তোমার লেখালিখির অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে না। তুমি মানসিক স্থিতি চাইছ, তা পাচ্ছ না। তোমার মধ্যে জমা হচ্ছে ক্ষোভ, রাগ, অভিমান। এ-সমস্তই কিন্তু তোমার লেখার মাল-মশলা। তোমার মধ্যে যদি কবিতা সত্যি থেকে থাকে, বা কবিতা যদি চায় তুমি কবিতা লিখবে, তাহলে আস্তে-আস্তে এই প্রতিকূলতাই তোমার মূলধন হয়ে দাঁড়াতে পারে। আমার মনে হয়, দ্বন্দ্ব তৈরি না হলে লেখা বেরিয়ে আসা মুশকিল। দ্বন্দ্ব চাই। নিজের সঙ্গে নিজের দ্বন্দ্ব। জীবিকার তুমি আর কবিতার তুমি-র মধ্যে দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বটা খুব জরুরি। আমার মনে হয়, এই দ্বান্দ্বিক সম্পর্কটা থাকলে ভালো হয়। এভাবেই জিনিসটা নেওয়া উচিত।

তন্ময় : চারপাশে কবিতা নিয়ে এত আড্ডা দেখি। কবিতা নিয়ে আড্ডা একটা স্তর পর্যন্ত চিন্তাকে প্রসারিত করে। কিন্তু কোথাও গিয়ে কি এই ব্যাপারটা কবির মতকেও প্রভাবিত করে? কবির নিজের নির্জনতাকে নষ্টও করে দেয়?

রাহুল : করে দেয়। করে দিতে পারে। সেই কবি যদি অন্যের দ্বারা সাংঘাতিক প্রভাবিত

হয়ে থাকে, তাহলে। অনেকে আছেন, প্রভাবিত হন না, যত আড্ডাতেই থাকুন না কেন। আমার লেখাটা আমি লিখব। সেরকমও আছে।

তন্ময় : তুমি একটু আগে বলছিলে, এখনকার সময়ে কবিতা লেখা খুবই কঠিন। কারণ এখন চারপাশের বৈচিত্র্যগুলো অনেকটা সঙ্কুচিত হয়ে উঠেছে। সারল্যের কাছাকাছি পৌঁছনো অনেকক্ষেত্রেই সীমিত হয়ে আসছে। ফলে, যত দিন যাচ্ছে, অন্তর্দৃষ্টিটাই আরও বেশি করে প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়াচ্ছে?

রাহুল : আমার মনে হয়। কারণ আমাদের কাছে বিস্ময় ব্যাপারটাই কমে গেছে।

তন্ময় : অর্ন্তদৃষ্টি চিরকালই ছিল। কিন্তু এখন কি আরও তীক্ষ্ণ হচ্ছে সময়ের কারণে?

রাহুল : হচ্ছে বলে আমার মনে হয়। কারণ বিস্মিত হওয়া, বিস্ময়, আশ্চর্য এই শব্দগুলো কিন্তু আমাদের জীবন থেকে আস্তে-আস্তে হারিয়ে যাচ্ছে। এই টেলিভিশন জিনিসটা তোমার সংসারে যখন ঢুকেছে সর্বনাশ করেছে। কৃত্রিম একদম। তছনছ করে দিয়েছে একেবারে। অদেখা অজানা বলে কিছুই নেই আর। এখন তো আরও বেশি। ইন্টারনেটের যুগ। একটা বাটন টিপলেই সমগ্র পৃথিবী তোমার সামনে। সৃষ্টির ক্ষেত্রে এগুলো খুব গঠনমূলক নয়। ফলে অর্ন্তদৃষ্টি বেশি প্রয়োজন মানুষের। ভাবনাটা অনেক জোরদার হওয়া দরকার।

তন্ময় : সেই কারণে হয়তো কবিতা খানিকটা জটিলতার দিকেও যাচ্ছে।

রাহুল : জটিলতার দিকে যে শুধু যাচ্ছে, তাই না, কবিতার মধ্যে বিভিন্ন টেকনিক্যাল টার্ম ঢুকে যাচ্ছে। এটা মন্দ কী ভালো তা জানি না। প্রাচীন পাঠক হিসেবে আমার সঙ্গে তার দূরত্ব বাড়ছে। কেন-না ওই টেকনিক্যাল ব্যাপারটা আমি জানি না। আমার কাছে বিষয়টা আরোপিত মনে হয়। আমার যে বাস্তবতা, আর এখন যারা কবিতা লিখছে তাদের বাস্তবতার মধ্যে বিস্তর ফারাক।

তন্ময় : তোমার কি মনে হয় যে, প্রথম দশকের কবিতালিখিয়েদের অনেক প্রতিকূলতা ও সহজলভ্যতার মুখোমুখি হতে হচ্ছে? এইসময় বাস্তবিক অর্থে পৃথিবীটা খুলে গেল। সোশ্যাল মিডিয়া, অনলাইন মিডিয়া, বই বিপণন, বই প্রকাশের চরিত্র বদলানো এবং কলেজ স্ট্রিটের খানিকটা চরিত্র বদলানো সব মিলিয়ে ভালো এবং মন্দে মিশে একটা বড়ো জটিল ও সহজলভ্য সময়ে এসে দাঁড়ানো।

রাহুল : সৃষ্টি অনেকগুলো প্রতিকূলতার মুখোমুখি হচ্ছে। হবে। কিন্তু সৃষ্টির প্রকাশ খুব সহজ হয়েছে। এবং আস্তে-আস্তে একটা সময় দেখবে, এসব অনেকটা গা-সওয়া হয়ে যাবে। কিন্তু বারবার আমার নিজেকে প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করে। এই যে টেকনোলজি এত উন্নত হচ্ছে, মানুষের চলাফেরার প্রয়োজন হয় না, ঘরে বসে

সব পেয়ে যায়, এতে মানুষে-মানুষে সম্পর্ক আর কতটুকু থাকবে? কবিতা তো একধরনের সম্পর্ক। মানুষে-মানুষে সম্পর্ক। বস্তুর সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক। বিভিন্ন ধরনের সম্পর্ক। সম্পর্কই যদি না থাকে তাহলে সাহিত্যের কী হবে!

তন্ময় : আমরাও যখন প্রথম এলাম, প্রথম দশকের গোড়ার দিকে, তখনও অনেকের মধ্যে একধরনের মৌলবাদ কাজ করত যে, আমি মুদ্রিত পত্রিকা ছাড়া কোথাও লেখা দেব না। এমনকি অনেক সিনিয়ররাও এমনটাই মনে করতেন ২০১৫-১৬ পর্যন্ত। এই জায়গাটা কিন্তু পুরো ভেঙে গেছে। যত দিন যাচ্ছে, সাধারণ মুদ্রিত লিটল ম্যাগাজিনের জায়গাটা আস্তে-আস্তে হারিয়ে যাচ্ছে। কেউ যদি নতুন পত্রিকা করার কথা ভাবে, তাদের মধ্যে সত্তর শতাংশ এখন অনলাইনে এগোচ্ছে।

রাহুল : ব্যক্তিগতভাবে আমি ছাপা কাগজে পড়তে ভালবাসি। হাত দিতে পারি তার মধ্যে। ছুঁয়ে দেখতে পারি। সর্বোপরি একটা সম্পর্ক তৈরি হয়ে যায়। কিন্তু আমাদের পরবর্তী সময়ে যারা এল, এই ধরো তোমরাই, আস্তে-আস্তে পোর্টালে পড়ায় অভ্যস্ত হয়ে গেছ। সময় আস্তে-আস্তে গ্রাস করে সব। সময় আমাদেরও গ্রাস করবে আস্তে-আস্তে।

তবে আরেকটা দিকও রয়েছে। সারা পৃথিবীর লেখা আমরা পড়তে পারছি। আগে যেটা হত না। বাংলাদেশের লেখাই পড়তে পারতাম না। এখন সবার লেখা পড়তে পারছি। সারা পৃথিবী আমার লেখা পড়তে পারছে। ফলে একধরনের যোগাযোগ তৈরি হচ্ছে।

তন্ময় : সেই কারণে কি কোথাও মুড়ি-মিছরি একদরও হয়ে যাচ্ছে না?

রাহুল : সে তো হবেই। সোশ্যাল মিডিয়ায় কবিতার থেকে কমেন্টস বেশি পড়ি আমি। একধরনের মজা পাই। কে কী লিখছে আর কী। কতজন এসে কমেন্ট লিখে যায়। আমার পরিচিত একটি ছেলে শ্রীজাত-র কবিতার নীচে কমেন্ট লিখত। বেশ তিন-চার লাইন লিখত। রোজ। শ্রীজাত-তো প্রচুর লিখত। প্রায় প্রতিদিনই পোস্ট করত। তার নীচে লিখত। আমি ওয়ালে ঢুকে ওর কমেন্টগুলো পড়তাম। কিন্তু সেই লোকটা যদি পরপর দুদিন বা তিনদিন পর যদি কমেন্ট না লিখত, আমার ভয় হত। মারা গেল কি-না! মানুষকে অনেক সৃষ্টিশীল করেছে এই সোশ্যাল মিডিয়া। আস্তে-আস্তে কমেন্ট সাহিত্যও তৈরি হতে পারে।

তন্ময় : আচ্ছা, তুমি এর আগে একবার বললে, তিন দশক বা চার দশক পেরিয়ে এসে অনেকেই হারিয়ে যান। সোশ্যাল মিডিয়ার জগতে তো সবাই আছেন। সবাই লিখছেন। সবকিছুই করছেন। কাজেই ওই সমীকরণটা আজ থেকে পাঁচ বছর পর ঘেঁটে যাবে না?

Scanned with OKEN Scanner

রাহুল : হ্যাঁ। নিভৃতি নষ্ট হবে তো আস্তে-আস্তে। একজন কবির যে নিভৃতির প্রয়োজন হয়, সেটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ফলে কবিতা লেখা ভীষণ কঠিন বিষয় হয়ে দাঁড়াচ্ছে। লেখার জন্য যে নির্জনতার, নিভৃতির প্রয়োজন হয়, সোশ্যাল মিডিয়া এসে সেটা ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে।

তন্ময় : সোশ্যাল মিডিয়ার আরও একটা খারাপ দিক হল, কেউ যদি দীর্ঘদিন কোনো লেখা পোস্ট না করে, তার কাছে এই প্রশ্নও অনেকসময় উঠে আসে, সে লেখালিখি ছেড়ে দিয়েছে কি-না। যেন তোমাকে তোমার নামটা আজকের দিনে মানুষের মাথায় ভাসিয়ে রাখতেই হবে কোনো-না-কোনোভাবে। নইলে মানুষ তোমায় সহজে ভুলে যাবে।

রাহুল : এটা কোনো সুপারমার্কেটও নয়। আমি এখন হাটে বসি। আমি এখন হাটুরে। এবং পুরনো খাতা থেকে পোকা কাটা পণ্য নিয়ে আমি বসি। এবং সন্ধ্যাবেলা না-বিকোনো পণ্য নিয়ে ঘরে ফিরে যাই। এই তো কবির জীবন। সে এসেছে কবিতা নিয়ে। কেউ সেসব কিনবে সেই আশা নেই, প্রত্যাশাই নেই। ফলে প্রচুর কবিতার বই বিক্রি হচ্ছে, এটা একধরনের সন্দেহজনক। হঠাৎ করে মানুষের কী হল ! অমুক শিল্প বুঝে ফেলল এত সহজে ! এই বুঝে যাওয়াটা সর্বনাশের। যা ছিল তোমার একার সম্পত্তি, হয়ে গেল দশটা লোকের। সারা দেশ জানে। একসময় খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠছ আস্তে-আস্তে। সকাল-বিকেল মালা পাচ্ছ। ফিতে কাটছ। হলটা কী তাহলে? বিরাট সর্বনাশ! কবিতার যে নিভৃতির জায়গা, সেটা ভেঙে যাচ্ছে আস্তে -আস্তে। আমি এমন কথা বলছি না, যে, সারাজীবন তুমি লিখে যাবে, অথচ কেউ পড়বে না তোমার লেখা। লোকে পড়বে। অনেকসময় পড়বেও না। সেসব তোমায় গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু এই বাজারে চলে আসা, এটা কিন্তু ইদানিং একটা প্রবণতায় পরিণত হয়েছে।

তন্ময় : এবং এটা কি একটা মানসিক চাপও তৈরি করে না? আমার সমসাময়িক সবাই বাজারে এসে বসছে আমি থাকব না কেন?

রাহুল : নিজের সঙ্গে লড়াইটাই তো এই জায়গায়। তুমি যদি ভাবতে পারো, আমি যাব না বাজারে, আমি আমার মতো থাকব, আজ থেকে দশবছর পরে তুমি কিন্তু একটা তৃপ্তি লাভ করবে যে, আমি আলাদা। আমি অন্তত ওই ভিড়ে যাইনি। নিজেকে জড়াইনি ওর মধ্যে। আমাদেরও সময়ে তো খুব সহজ ছিল বিখ্যাত হওয়া। এখন তো অনেক কঠিন। এখন সবাই বিখ্যাত। আমাদের সময়ে বিখ্যাত হওয়াটা কঠিন ছিল না কিন্তু। তবে কিছু কিছু নিয়ম মানতে হত। অমুকের কাছে যেতে হবে। অমুকের সঙ্গে মিশতে হবে। বলতে হবে আমার বই বের করে দিন। খুব সহজ এগুলো। একসময় প্রচুর লোকে করেছেও এসব। এখন যেটা হচ্ছে। এখন এটা বলতে হয় না। নিজেই নিজের বই বের করে।

তন্ময় : সেইসময়কার কতিপয় লোক কিন্তু এখনও পুরনো মৌরসিপাট্টা ভাঙিয়ে সেই প্রতিষ্ঠানের আদলটা বজায় রেখেছেন। এখনও কিছু কিছু লোক সেইসব জায়গায় হয়তো যান। কিন্তু সেই জিনিসটা আরও ভাঙবে যত সময় যাবে।

রাহুল : এসব লোকেরা জোর করে বজায় রাখছেন আর কী। তাদের অবস্থা খুব খারাপ হবে। জীবিত অবস্থাতেই হবে খারাপ। কারণ শিল্প কখনও উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করে না।

তন্ময় : গত দশবছরেও যে পরিমাণে বদল দেখেছি, তা বিস্ময়কর। একটা সময়, ধরো ২০১১-১২ সালেও 'দেশ'-এ লেখা বেরনো মানে আহা কী ব্যাপার! এখন কিন্তু কিছু যায়-আসে না। কীসের 'দেশ'? কী যায়-আসে? আরেকটা বিষয় হচ্ছে, আমরা যেমন একটু পিছন ফিরে দেখলে এই কবিরা ষাটের, সত্তরের এঁরা— এমন চিহ্নিত করতে পারি। হয়তো আজ থেকে চল্লিশ বছর পরে এইসময়কার কবিদের চিহ্নিতই করা যাবে না। হয়তো সেই সময়েই অ্যাকটিভ চল্লিশ-পঞ্চাশজনের নাম উঠে আসবে। আমি সত্তর দশকের কবিদের চিনলাম কীভাবে? বইয়ের মাধ্যমে। বা হয়তো কোথায় দেখা হল, সে-সূত্রে। এখন তো সবাই সবাইকে সোশ্যাল মিডিয়ায় চিনছে।

রাহুল : খুবই ইন্টারেস্টিং। টেকনোলজির প্রভাব সাহিত্যের ওপরে পড়েছে। সাহিত্যে অপাপবিদ্ধ জায়গা ছিল একটা। অপাপ বা পাপবিদ্ধ জায়গা। সেখানে এসে টেকনোলজি হাত দিয়েছে। টেকনোলজির হাত দেওয়া ভয়ংকর। টেকনোলজি করে দিচ্ছে অনেককিছু। অনেকে নাকি মোবাইলে কথা বলতে-বলতে উপন্যাস লিখে ফেলে। কলম-কাগজ-মনের যে সম্পর্ক, এর মধ্যে সে-সম্পর্ক আর নেই। খুব সহজ হয়ে গেছে জীবনটা।

তন্ময় : আমার মনে হয় এই একুশ শতকের শূন্য দশকও না, প্রথম দশক থেকে বোধহয় আলাদা একটা অগ্রগতি বা বিচ্যুতি হল। এরপরে খুব স্পষ্টভাবে এদিক-ওদিক ভাগ করা যাবে।

রাহুল : হয়তো।

তন্ময় : এখনও পর্যন্ত পূর্বজদের বেশ-কিছু মিথ বর্তমান। সেই মিথের জায়গাটা সরে গিয়ে, ভবিষ্যতে সম্পূর্ণ নতুন কিছু তৈরি হবে। এই মিথগুলো আর থাকবে না। আমরা আজকে শুনি সুনীল-শক্তি এই করেছিলেন, ওই করেছিলেন, কিংবা রাহুল পুরকায়স্থ অমুক সময়ে এই করেছেন। এখন তো কোনো গল্পই কোনো গল্প না। সব মিথই কোনো ছবি নয় ভিডিও। সবাই দেখছে।

রাহুল : আমাদের জীবনের আবছায়াগুলো আস্তে-আস্তে স্পষ্ট হয়ে গেছে। ফলে আবছায়া যদি না থাকে সেক্ষেত্রে শিল্প-সাহিত্য খুব কঠিন বিষয় বলে আমার

Scanned with OKEN Scanner

মনে হয়। সবই প্রকট হয়ে যাচ্ছে। গোপনীয়তা সেই অর্থে নেই। ব্যক্তিগত জীবন বলেও তো কিছু নেই।

তন্ময় : কিছু কিছু কবির এখনও বিগ্রহ, পূজনীয়— এমন একটা ইমেজ। এই ইমেজের জায়গাটাও আস্তে-আস্তে পুরো ধ্বসে যাবে। ধুর ও কী? অমুকও তো! এরকম একটা।

রাহুল : জীবন্মৃত আসলে। লিখছে নিজেরই জন্য। এখন সবাই কবিতা লেখে। সবাই ওই শর্ট-ফিল্ম করে। কী করো? শর্ট-ফিল্ম করি। কবিতা লিখি। ফলে ভাল-খারাপ তো অনেকদূরের কথা। একটা কবিতা আমি পড়ব কেন? পাঠকের মনে এই প্রশ্নটা উঁকি মারার অবকাশটাই আর থাকে না। তুমি ফেসবুক খুললেই প্রচুর কবিতা পেয়ে যাবে।

তন্ময় : অনেকে তো শুধু ফেসবুকের কবিতা পড়েই কবি হয়ে যায়। আলাদা করে বই কেনার বই পড়ার প্রয়োজনীয়তা বোধ করে না। 'ফেসবুকে পড়েছি অনেক, এই-ই যথেষ্ট।'

রাহুল : প্রচুর আছে এমন। প্রচুর আছে। ভবিষ্যৎ যে কোনদিকে যাবে, বৃহত্তর ক্ষেত্রে, তা নিয়ে দুশ্চিন্তা হয় এসবের জন্যেই। দেখা যাক! আমরা আশঙ্কা-আলোচনা করতে পারি। সময়ই উত্তর দিয়ে দেবে। তার জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া সত্যিই গতি নেই কোনো...

Scanned with OKEN Scanner